মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৩

বিরঞ্জন রায়

এবছর কার্ল মার্ক্সের পুঁজি প্রকাশের ১৫০ বছর। এই বছর রুশ বিপ্লবেরও শততম বার্ষিকী। শুধু বার্ষিকী বলে নয়, বলা যায়, একে উপলক্ষ করে মার্ক্সীয় দর্শন ও রুশ বিপ্লব পর্যালোচনায় আমরা বিশেষ মনোযোগ দেবো। সারা দুনিয়া জুড়েই এবছরে এই উপলক্ষে অনেক আলোচনা, সেমিনার, সম্মেলন, বিতর্ক ও প্রকাশনা হচ্ছে। তাঁদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য লেখা বা বক্তৃতাও আমরা বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করতে চাই। আমরা বছর জুড়েই এসম্পর্কিত লেখা প্রকাশ করবো। বর্তমান প্রবন্ধটি কয়েক পর্বে প্রকাশিত হবে। এতে মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রেক্ষাপট, দার্শনিক বিভিন্ন ধারা এবং মার্কসের ডক্টরাল থিসিস ধরে আলোচনার বিস্তার ঘটানো হয়েছে।

মার্ক্সের ডক্টরাল থিসিসের পটভূমি

হেলেনীয় দার্শনিকদের মধ্যে মার্ক্স যে এপিকুরসকে তার ডক্টরাল থিসিসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। আমরা দেখেছি, মার্ক্সের বেড়ে উঠার সময়ে জার্মানী তার পশ্চিমের প্রতিবেশীদের থেকে পিছিয়ে ছিল। জার্মান-রাষ্ট্র ধর্মের মোড়কে নাগরিক পীড়নকে বৈধতা দিত। তাই সেই সময়ে উঠতি বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, শ্রমিক সবাই এমন এক দর্শনের প্রত্যাশী ছিল, যা ব্যক্তির আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জয়গান গায় এবং সব ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভয়ের বিরোধিতা করে। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এপিকুরসেই এ-তিনের মিলন ঘটেছিল।

মার্ক্স বেড়ে উঠেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন সমাজে বিজ্ঞানের ফলিত দিকটির প্রভাবের চেয়ে দার্শনিক (আদর্শিক) দিকটির প্রভাব বেশি কার্যকর ছিল। বাম হেগেলীয় ফয়েরবাখ History of Modern Philosophy from Becon to Spinoza (১৮৩৩) গ্রন্থে বেকনের বস্তুবাদী দর্শনের জয়গান গেয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, ফ্রান্সিস বেকনই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। বেকন তার বস্তুবাদী দর্শন গড়ে তুলেছিলেন এপিকুরীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে। শুধু ব্রিটিশ বস্তুবাদ নয়, ফরাসি বস্তুবাদেরও ভিত্তি ছিল এপিকুরীয় দর্শন। মার্ক্স তার পিতার মাধ্যমে ছেলেবেলাতেই ফরাসি বস্তুবাদীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, আর বেকন পড়েছিলেন গুরুত্ব সহকারে হেগেল পাঠের আগেই। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানের জন্য সংকল্পবদ্ধ। এপিকুরীয় দর্শনের প্রতি সম্ভ্রমহীন হেগেলই তো বলেছেন, 'এপিকুরসই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রকৃতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উদ্ভাবক'। হেগেলের প্রকৃতিদর্শনে প্রকৃতি, চিন্তার আত্মবিযুক্ত রূপ মাত্র। চিন্তা যেন এর 'অমূর্ত সার্বিক' রূপ থেকে 'মূর্ত সার্বিক' পরম ভাব-এ ফিরে আসতে পারে, এজন্য চিন্তা, প্রকৃতি রূপে আত্মবিযুক্ত হতে বাধ্য। অর্থাৎ হেগেলের প্রকৃতিদর্শনে প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বত্তা নয়; পরম চেতনার বিবর্তনের একটি পর্যায় মাত্র। পক্ষান্তরে এপিকুরীয় দর্শনে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মার্ক্স এপিকুরসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বেকনের মাধ্যমে। প্রকৃতি-দর্শনকে নীতি-দর্শনের অধীনস্ত করা, যা বেকনের কাছে এপিকুরসের দোষ বলে মনে হয়েছিল, তা-ই মার্ক্সের কাছে গুণ বলে প্রতিভাত হল। কিন্তু মার্ক্স বেকনের মতোই এপিকুরীয় দর্শনের পরম-উদ্দেশ্যবাদ বিরোধী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলেন। বেকনের দৃষ্টিতে গ্রীক পুরাণ-উক্ত প্রমিথিউস, দেমক্রিতস। মার্ক্সের কাছে প্রমিথিউস দেমক্রিতস নন, এপিকুরস। এপিকুরসের মতো মার্ক্সের কাছেও গ্রীক পরমাণুবাদীদের নিয়তিবাদ শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয়েছিল। মার্ক্সপূর্ব আধুনিক বস্তুবাদীরা এ নিয়তিবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। এপিকুরীয় দর্শনের নিয়তিবাদ মুক্ত বস্তুবাদ, যা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার পরিসর রাখে, মার্ক্সকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মার্ক্সের এপিকুরস প্রীতির মূলে উপরে বর্ণিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ছাড়াও একটি সাক্ষাৎ উদ্দীপক ছিল। তা জার্মানীতে 'প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব'র (natural theology/religion) প্রবক্তা স্যামুয়েল রেইমার্স-এর (১৬৯৪-১৭৬৮) রচনাপাঠ। জার্মান ভাষায় ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এবং ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ডাচ্, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় অনুদিত এ রচনার নাম, 'The Principal Truth of Natural Religion Defended'। এর উপশিরোনাম, 'Wherein the Objection of Luctretius, Buffon, Maupertuis, Rousseau, La Mettre, and Other Ancient and Modern Followers of Epicurus are Considered, and Their Doctrines Refuted'। এ-রচনা এবং এমন আরো রচনায় রেইমার্স প্রমাণ করতে চাইতেন, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পিছনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বিদ্যমান। এসব মার্ক্সের মনে তীব্র বিরোধিতার সঞ্চার করেছিল। রুশো এবং লা মেত্রি প্রসঙ্গ 'এপিকুরস ও আধুনিকতা' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। বুফোঁ (১৭০৭-১৭৮৮) ছিলেন ফরাসি প্রকৃতিবিদ। প্রাকৃতিক ইতিহাস নামক বিশ্বকোষ উপম রচনায় তিনি প্রাকৃতিক সমস্ত বিষয়কেই পরস্পর সম্পর্কিত এবং বিকাশমান অবস্থায় বর্ণনা করেন। তিনি প্রকৃতিকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা না করে, তুলনা করেছেন এক বিশাল জীবের সঙ্গে, যা ঐশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজস্ব নিয়মে চালিত। মোপারতুই (১৬৯৮-১৭৫৬) ছিলেন ফরাসি গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং জীববিজ্ঞানী। তিনি দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ (দ্য গ্রেট)-এর আমন্ত্রণে 'বার্লিন বিজ্ঞান একাডেমী'র সভাপতি পদে ১৭৪৫-১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

কৈশোর থেকেই মার্ক্স ছিলেন গ্রীক-লাতিন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। ১৮৩৯ সনে মার্ক্স তার ডক্টরাল থিসিসের প্রস্তুতি হিসেবে প্রাচীন গ্রীক দর্শন পাঠ শুরু করেন। তার ইচ্ছা ছিল, হেগেল যে যুগের দর্শনকে অবজ্ঞা করেছেন, সেই হেলেনীয় যুগের দর্শন (স্টোয়িক, এপিকুরীয়, স্কেপটিক) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার। সেই রচনায়, গ্রীক দর্শনের এই পরিণতি থেকেই সমগ্র গ্রীক দর্শনকে অবলোকন করতে চেয়েছিলেন তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। গ্রীক দর্শনের প্রগাঢ় সমালোচনামূলক অধ্যয়নের ফসল তার সাতটি নোট বই। (বইগুলোর খন্ডিত রূপই আমাদের কাছে পৌঁছেছে।) তিনি গ্রীক দর্শনকে পাঠ করেছেন গ্রীক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে প্রতিতুলনায়। নোট বইগুলো মার্ক্সের দার্শনিক রচনার প্রথম নিদর্শন। নোট বইয়ে তার মন্তব্যসমূহ ঘনীভূত যুক্তি, রূপক ও উপমার ঠাসবুনুনি। এগুলোতে প্রকাশিত প্রগাঢ় দার্শনিক চিন্তার স্ফুলিঙ্গ, পাঠমাত্র চমকে দেয়। এ-সবের গভীরতা ও বহুমাত্রিকতা চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে। মার্ক্স পরবর্তী জীবনে, নোটগুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন চিন্তাসূত্রে বার বার ফিরে

এসেছেন। (মার্ক্সের অধ্যয়নের ধরনটি ছিল, অধীত বিষয়ের বিস্তারিত নোট নেওয়া এবং পাশে পাশে মন্তব্য লেখা। এ ছাড়াও তিনি নিজের চিন্তাভাবনাকে খসড়া আকারে লিখে রাখতেন। ফলে তার সম্পন্ন লেখার চেয়ে অসম্পন্ন লেখার পরিমাণ কয়েকগুণ বেশী। আর এসব অসম্পন্ন লেখা, সম্পন্ন লেখার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।)

হেগেলের ভাষায়, 'Philosophy is its own time comprehended in thoughts.' (সমসাময়িক কালের মর্মকে চিন্তায় বোধগম্য করে তোলাটাই দর্শন।) মার্ক্স গ্রীক দর্শনের প্রতিটি ধারাকে পর্যালোচনা করে হেগেলের বক্তব্যটি প্রতিপাদিত করেছিলেন। গ্রীক দর্শনের সার্বিক মুল্যায়ন করে তিনি লিখেছিলেন, 'এপিকুরস সমেত সমস্ত প্রাচীন দার্শনিকদের দুর্বলতা হল, তার জানেন প্রত্যয়ের অবস্থান চেতনায়। কিন্তু তারা জানেন না প্রত্যয়ের সীমারেখা কোনটি, এদের মূলনীতি কি, এদের আবশ্যিকতাই বা কি।' গ্রীক দর্শনের প্রশংসা করে মার্ক্স বলেন, 'গ্রীকরা তাদের অপূর্ব বিষয়নিষ্ঠ অকৃত্রিমতার গুণে চিরদিনই আমাদের শিক্ষক হয়ে থাকবেন। সে গুণ সবকিছুকে উজ্জ্বল করে তোলে, যেন সেসব প্রকৃতির বিশুদ্ধ আলোকে নগ্ন; সে আলো যত মৃদুই হোক না কেন।' তারপর গ্রীক দর্শনের এ গুণটির সঙ্গে তুলনা করেন তার সমসাময়িক দর্শনকে। তার ভাষায়, 'বিশেষত আমাদের সময় এমনকি দর্শনেও অশুভ প্রপঞ্চের জন্ম দিচ্ছে, যেসব জঘন্যতম পাপের দোষে দায়ী। এ হল চৈতন্য ও সত্যের বিরুদ্ধে পাপ। কারণ, এখানে দার্শনিক বিচার-বিবেচনার পিছনেও লেগে থাকে গোপন উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের পিছনে গোপন বিচার-বিবেচনা।'

দর্শনের অগ্রগতি কিভাবে ঘটে, কিভাবে দর্শনের ইতিহাস রচনা করতে হবে; নোটবইয়ে এ-সব বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। মার্ক্সের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল, তার সমসাময়িক দার্শনিক পরিস্থিতিকে অনুধাবন করা। এজন্য তিনি দর্শনের ইতিহাস থেকে সাহায্য নিতে চেয়েছেন। মার্ক্সের মতে, একটা সময় পর্যন্ত, দুনিয়ার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় দর্শনের সরলরৈখিক অগ্রগতি ঘটতে থাকে। তারপর দর্শন নিজস্ব তন্ত্রে সংগঠিত হয়ে দুনিয়ার পাল্টা আরেকটি দুনিয়া হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি ঘটেছে আরিস্ততেলেস ও হেগেলের বেলায়। এইসব সার্বিক দর্শন যখন তার মতো করে দুনিয়াকে বদলে নিতে চায়, তখন তা আর তার অখন্ডতা ধরে রাখতে পারে না। সার্বিক দর্শন, পরস্পর বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। তখন দর্শনকে কোনো চরিত্রের মুখোশ পড়তে হয়, অর্থাৎ কোনো সামাজিক বর্গের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয়। যেমন, আরিস্ততেলেসের সার্বিক দর্শনের পর, গ্রীক দর্শন সিনিক, স্কেপটিক, স্টোয়িক ও এপিকুরীয় দর্শনে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে হেগেলের সার্বিক দর্শনের পর হেগেলীয়রাও দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বামদল পড়েছিল উদারপন্থার পোষাক, আর ডানদল রাজতন্ত্রের পোষাক। মার্ক্স বলেছেন, দর্শনকে বাস্তবায়িত করার সময়, জগৎ দর্শনায়িত হওয়ার সাথে সাথে দর্শনও জাগতিক হতে থাকে। কোনো দর্শনকে বাস্তবায়ন করা মানে সে দর্শনকে হারিয়ে ফেলা। অর্থাৎ বাস্তবায়িত হয়ে গেলে কোনো দর্শনের আর দার্শনিক অস্তিত্ব বহাল থাকে না। (মার্ক্সের নিজের দর্শনের বেলায় এ নিয়মটি কিভাবে কার্যকর হয়েছে তা একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে।)

মার্ক্স ১৯৪০ সনে ডক্টরাল থিসিস রচনায় হাত দেন। এ থিসিসে ধর্মতত্ত্বের উপর দর্শনের সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়েছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণশীল দর্শন বিভাগে এটি অনুমোদন পাওয়ার ভরসা ছিল না। তাই মার্ক্স ইয়ানা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত উদার দর্শন বিভাগে থিসিসটি জমা দেন। (জার্মানী প্রাচীন এ-বিশ্ববিদ্যালয়টি হেগেল ও শেলিঙ সহ অনেক বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তির কর্মস্থল।) তিনি এটি জমা দিয়েছিলেন ১৮৪১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে, সে মাসেই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। রচনাটি ছাপাবার ইচ্ছা ছিল বলে তিনি এর উৎসর্গপত্র এবং নতুন ভূমিকার খসড়া লেখেন। কিন্তু রচনাটি ছাপানো সম্ভব হয় নি। পরে মার্ক্সের লেখা মূল পান্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। কোনো অজানা হাতের অসম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি পাওয়া যায়; যাতে মার্ক্স নিজ হাতে কাঁটাছেড়া করেছেন। রচনাটি দুইটি অংশে বিভক্ত। উদ্ধার হওয়া পান্ডুলিপিতে রচনার প্রথম অংশের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় পাওয়া যায় নি। তবে হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ অধ্যায়ের একটি টীকা এবং পরিশিষ্টের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে। ডক্টরাল থিসিসটি প্রথম ছাপা হয় (মূল জার্মান ভাষায়) স্টুটগার্ট থেকে ১৯০২ সালে। মার্ক্স-এঙ্গেলস এর রচনাবলীর প্রথম খন্ডে নোট বই সাতটি ছাপা হয় মস্কো থেকে, ১৯২৭ সালে।

থিসিসটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মার্ক্স-গবেষকগণ এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করছেন। গবেষকগণকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ মার্ক্সকে মানবতাবাদী হিসেবে দেখাতে চান। তাদের মতে তরুণ মার্ক্স মানবতাবাদী। পরিণত মার্ক্স বা 'পুঁজি'-র মার্ক্স বস্তুবাদী। এ দুই মার্ক্সের মধ্যে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ফাঁক রয়েছে। অন্য পক্ষটি মার্ক্সের বিকাশে এ বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেন না। তারা বলেন পরিণত মার্ক্স তরুণ মার্ক্সেরই ক্রমবিকশিত রূপ। এ মার্ক্স বস্তুবাদী। মানবতাবাদী পক্ষীয়রা ডক্টরাল থিসিসকে তাদের স্বপক্ষের আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে বস্তুবাদীরা এটিকে মনে করেন মার্ক্সের প্রাগবস্তুবাদী পর্যায়ের নিদর্শন হিসেবে। কিন্তু আমরা দেখব, মার্ক্স তার প্রকাশ করতে চাওয়া প্রথম রচনাটিতেই 'মার্ক্সবাদের' নির্ভুল স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রীক পরমাণুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্স হেগেলের 'ভাববাদী ডায়ালেকটিকস'কে 'বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস'-এ এবং এপিকুরসের 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ'কে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-এ রূপান্তর করেছেন। মার্ক্সের এই পদক্ষেপটি ছিল তার 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এ উত্তরণের ভিত্তি। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস সমূহ'-ই (১৮৪৫ খ্রি) মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রথম সুসংহত প্রকাশ। কিন্তু আমরা দেখব, মার্ক্স তার ডক্টরাল থিসিসেই 'থিসিস সমূহের' সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তবে এখানে তার প্রকাশভঙ্গিটি 'থিসিস সমূহের' মতো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম নয়।

প্লুতার্ক ও কিকেরোর ভাষ্যে, এপিকুরস ও দেমক্রিতস-এর চিন্তায় পার্থক্য নেই। মার্ক্স এ দুইয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করেন এবং এপিকুরস-এর প্রশংসা করেন। এ হলো ডক্টরাল থিসিসটির বহিরাঙ্গিক। কিন্তু এর অন্তরালে আরও অনেককিছুই রয়েছে। যেমন বিজ্ঞান ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে বিতর্ক; সামাজিক বিকাশ এবং এর দার্শনিক চেতনা, এ দুইয়ের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক; ডান ও বাম হেগেলীয়দের বিতর্ক; সর্বোপরি জার্মান ভাবধারায় কান্ট বনাম হেগেল বিতর্ক। যেহেতু মার্ক্স তার সময়কার এসব দার্শনিক বিতর্কে ডুবেছিলেন, তাই তার ডক্টরাল থিসিসের অন্তরালে যে এসব বিতর্ক কার্যকর ছিল, সেটা বিস্ময়ের কিছু নয়। তিনি থিসিসটির পাদটীকায় এসব বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর এই জটিলতার জন্যই মার্ক্সের থিসিসটির অধ্যয়ন এবং ভাষ্য রচনা কঠিন। এই কঠিনতা আরো বেড়েছে কারণ, থিসিসে ব্যবহৃত ধারণাসমূহ প্রায়শই অস্বচ্ছ এবং আলোচ্য বিষয় ও দৃষ্টিকোণসমূহের সীমারেখা অস্পষ্ট। প্রকাশিতব্য এ রচনাটি যেন সেন্সরশীপের বাধা পেরুতে পারে, এ ভেবেও তিনি অনেক কথা সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলেছেন। থিসিসটি

সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের ভাষ্য তৈরী হয়েছে এসব কারণেই।

মার্ক্সের ডক্টরাল থিসিসটি 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' থেকে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে' উত্তরণের প্রথম নজির। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রথম সুস্পষ্ট ঘোষণা ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস সমূহ। মার্ক্সবাদী মহলে দ্বিতীটির গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও প্রথমটির নয়। এর কারণ মার্ক্স পরবর্তী জীবনে তার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এপিকুরসের ভূমিকা নিয়ে তেমন কিছু বলেন নি। সম্ভবত এর কারণ, মার্ক্স এপিকুরীয় দর্শনে যে বিষয়গুলো আরোপ করেছিলেন এবং এ-দর্শন থেকে যা আত্মস্থ করেছিলেন, এসবের সমর্থনে তার কাছে পর্যাপ্ত উপাত্ত ছিল না। তিনি এপিকুরস পাঠ করেছিলেন হেগেল পাঠে অর্জিত তার দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য পাঠে অর্জিত গ্রীক-লাতিন জগৎ সম্পর্কে তার অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে। এভাবে এপিকুরীয় দর্শনে প্রাপ্ত সূত্রগুলোতে বিধৃত ইঙ্গিত থেকেই অনুমান ও দ্বান্দ্বিক যুক্তির সাহায্যে তিনি তার সিদ্ধান্তগুলোকে টেনেছিলেন। পরে এপিকুরীয় দর্শনের আরো লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব গবেষণার উপর ভিত্তি করে এপিকুরীয় বিশেষজ্ঞগণ, বেইলি (Cyril Baily) এবং ফেরিংটন (Benjamin Frrington) স্বতন্ত্রভাবেই মন্তব্য করেছেন, এপিকুরস সম্বন্ধে ডক্টরাল থিসিসে করা মার্ক্সের বিশ্লেষণগুলো যথাযথ। তারা আশ্চর্য হয়েছেন, তার সময়ে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে মার্ক্স কিভাবে এসব সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। মার্ক্সের দার্শনিক বিকাশে এপিকুরস-এর ভূমিকার কথা রুশ বিপ্লবী আলেক্সেই মিখাইলোভিচ বদেন-এর (১৮৭০-১৯৩৯) নিকট ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্ত করেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তা বদেন-এর স্মৃতিচারণায় প্রকাশিত হয়।

(পরবর্তী অংশে আমি থিসিসটি অনুসরণ করেছি। উদ্দেশ্য, থিসিসের বক্তব্যটিকে উপস্থাপন করা। এজন্য আমি কখনো অনুবাদ, কখনো ভাবানুবাদ, কখনও বা ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার কোনো কথা থাকলে তা তৃতীয় বন্ধনীতে আবদ্ধ রেখেছি। থিসিস উপস্থাপনের পর আবার আমার প্রবন্ধে ফিরে এসেছি। থিসিসের অন্তর্গত শিরোনামগুলো পৃষ্ঠার মাঝামাঝি স্থাপন করেছি।)

ডক্টরাল থিসিস
'দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য'

নতুন ভূমিকার খসড়া

মার্ক্স তার থিসিসের ভূমিকাতেই জানাচ্ছেন, এটি একটি ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য রচিত অভিসন্ধর্ভ না হলে, তা এমন পন্ডিতী ধরনের না হয়ে কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক ধরনের হতে পারত। কিন্তু কিছু বাহ্যিক সীমাবদ্ধতার জন্য এ আকারেই তিনি বইটি ছাপাতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে বিজ্ঞানের প্রতি তার উচ্চ মনোভাব এবং সংকল্পবদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তারপরই তিনি দাবী করছেন, এই অভিসন্ধর্ভে তিনি গ্রীক দর্শনের একটি অসমাধিত সমস্যার সমাধান করেছেন।

মার্ক্স জানাচ্ছেন, এ গবেষণায় তার কোনো পূর্বসূরী নেই। প্রাচীনকালে কিকেরো এবং প্লুতার্ক এপিকুরস সম্বন্ধে যা আউড়েছেন, পরবর্তী লেখকরা এর চর্বিত চর্বণ করেছেন মাত্র। আধুনিককালে এপিকুরসকে নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছেন ফরাসি গণিতবিদ, দার্শনিক ও যাজক পিয়েরে গাসঁদি (১৫৯২-১৬৫৫)। 'বাস্তবায়িত অযৌক্তিকতার কাল' মধ্যযুগে, এপিকুরসের উপরে যে নিষেধের ঘেরাটোপ আরোপ করা হয়েছিল, তিনি তা থেকে এপিকুরীয় দর্শনকে মুক্ত করেছেন। তবে যিনি (গাঁসদি) নিজেই এপিকুরসের কাছ থেকে দর্শন শিখেছেন, তিনি অন্যদের এপিকুরস সম্বন্ধে কী শিখাবেন ? তিনি বরং এপিকুরসকে চার্চের উপযোগী করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। এ যেন উদ্দাম ও সতেজ গ্রীক দেহের উপর খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসিনীর স্বভাব চাপিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। [অবশ্য মার্ক্স থেকে দু'শ বছর দূরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গাসঁদির প্রচেষ্টাটি বিফল হয় নি। তার মাধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুবাদের সূচনা।] মার্ক্স এটিও জানাচ্ছেন, অভিসন্দর্ভটি তার একটি বড় কাজের অংশবিশেষ। সে কাজে তিনি সামগ্রিকভাবে হেলেনীয় দর্শন এবং এর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করবেন। এতে বর্তমান প্রবন্ধের আঙ্গিক ও অন্যান্য সমস্যা দূর হবে।

হেগেলের মতে এপিকুরীয় দর্শন বিমূর্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য/স্বাতন্ত্র্য, স্টোয়িক দর্শন বিমূর্ত বিশ্বজনীনতা/সার্বিকতা এবং স্কেপটিক দর্শন এ দুইয়ের নেতিকরণ। মার্ক্সের মতে মোটাদাগে হেগেলের এ সাধারণীকরণ যথাযথ এবং সামগ্রিকভাবে দর্শনের বিকাশের ইতিহাস রচনা করতে গেলে এর বেশি বিস্তারে যাওয়া অসম্ভব। অনুধ্যানমূলক চিন্তার চরম বিমূর্ততায় হেগেল আগ্রহী ছিলেন। তার এ মনোভঙ্গিটি হেলেনীয় দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ মূল্যায়নটি সম্ভব করেছে। আবার তার এ মনোভঙ্গিটিই গ্রীক দর্শন ও গ্রীক মানস সাপেক্ষে হেলেনীয় দর্শনের বিরাট গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেলেনীয় দর্শন সমূহই গ্রীক দর্শনের প্রকৃত ইতিহাস রচনার চাবিকাঠি। গ্রীক জীবনের সঙ্গে হেলেনীয় দর্শনের সম্পর্কের গভীর লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে মার্ক্সের র বন্ধু কার্ল ফ্রিডরিখ কোপ্পেন-এর এ সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে। মার্ক্সকে উৎসর্গীকৃত এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সনে।

মার্ক্সের অভিসন্ধর্ভটির বিষয়বস্তু 'দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য'। কিন্তু মার্ক্স এর পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছেন, 'এপিকুরসের ঈশ্বর তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্লুতার্কের বিতর্কের সমালোচনা'। এর মাধ্যমে তিনি দর্শন কিভাবে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত তা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। মার্ক্স ছিলেন চিন্তার রাজ্যে দর্শনের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। যুক্তি দর্শনকে যে সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় দর্শন সেখানেই যাবে। এতে কেউ (যেমন ধর্মতত্ত্ব) আহত হবে বলে দর্শন নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে না। এমনটি ঘটলে দর্শনের অবস্থা হবে 'এমন এক রাজার মতো, যিনি প্রজাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন'।

মার্ক্স জানতেন ধর্মতত্ত্ব সবসময়ই দার্শনিকগণের (প্রকৃত দার্শনিক মানেই মুক্ত চিন্তক) নামে অধার্মিকতার অপবাদ দেয়। এপিকুরসের কপালেও তাই জুটেছিল। তাই তিনি ধর্মতাত্ত্বিকদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন এপিকুরসেরই ভাষায়। দর্শন তার ভুবন-বিজয়ী পরম-মুক্ত হৃদয়ে শেষ রক্তবিন্দু স্পন্দিত হওয়া পর্যন্ত, এপিকুরসের দৃপ্ত কণ্ঠে, তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে প্রত্যুত্তরে কখনই ক্লান্ত হবে না : 'যে বহুজন পূজিত দেবতাদেরকে অস্বীকার করে, সে অধার্মিক নয়। বরং সে-ই অধার্মিক, যে দেবতাদের সম্বন্ধে বহুজনের বিশ্বাসকে সত্য বলে নিশ্চয়তা দেয়।' তারপর এ ঘোরালো বক্তব্যে সন্তুষ্ট না থাকতে পেরে উদ্ধৃত করেছেন এক্সিলোস-এর 'শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস' নাটকের সংলাপ, 'সোজা কথায়, আমি ঘৃণা করি দেবতাদের পুরো দঙ্গলটাকে-ই'। কারণ, স্বর্গের দেবতা কিংবা মর্ত্যের দেবতা, কেউই স্বীকার করে না যে, মানবিক আত্মচৈতন্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ দিব্যতা।

তৎকালীন শাসক, যাজক এবং তাদের চাটুকার বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে ভূমিকাটির শেষ উদ্ধৃতিটিতে। গ্রীক পুরাণের বীর প্রমিথিউস দেবতাদের জানা আগুনের ব্যবহার মানুষকে শিখিয়েছিলেন। এ অপরাধে দেবরাজ জিউস তাকে নির্বাসনে পাথরে

বেঁধে রেখে নির্যাতন চালাচ্ছিলেন। জিউস তার ভৃত্য হেরমিস-এর মাধ্যমে প্রমিথিউসকে জানিয়েছিলেন, যদি প্রমিথিউস জিউসের আনুগত্য মেনে নেন, তবে তার শৃঙ্খল-মুক্তি ঘটবে। এর জবাবে প্রমিথিউস যা বলেছিলেন, তা-ই দর্শনের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হিসাবে মার্ক্স উদ্ধৃত করেছেন 'শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস' নাটক থেকে।

'এ কথা নিশ্চিত জেনো–
ফেরাব না মন্দ ভাগ্য গোলামীর দামে,
ঢের ভালো এর চেয়ে পাষাণ শৃঙ্খল,
কিছুতেই হইব না,
দেবরাজ জিউসের বিশ্বস্ত বালক।'

অতঃপর মার্ক্স যুক্ত করেছেন, 'দর্শনের পঞ্জিকায় প্রমিথিউস মহানতম সন্ত ও শহীদ'। এ-তো প্রমিথিউসের সংলাপে মার্ক্সেরই আত্মঘোষণা। তিনি শ্রমজীবীদের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করেছেন বলে আজীবন নির্বাসন ও দারিদ্র্যের কষাঘাত সয়েছেন। তবুও ভাগ্য বদলের জন্য কায়েমী স্বার্থের কাছে আপোষ করেন নি।

প্রথম অংশ : সাধারণভাবে দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য

প্রথম অধ্যায় : অভিসন্ধর্ভের বিষয়বস্তু

এমনটি মনে হয়, 'দর্শনের আলেকজান্দ্রস' আরিস্ততেলেস-এর মধ্য দিয়েই যেন গ্রীক দর্শনের সমাপ্তি ঘটে গেছে। এপিকুরীয়, স্টোয়িক ও স্কেপটিক এ তিনটি হেলেনীয় দর্শনিক ধারাকে মনে হয় যেন একটি অযথার্থ সংযোজন, যার সঙ্গে পূর্ববর্তী শক্তিশালী গ্রীক দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। এপিকুরীয় দর্শনকে মনে করা হয় দেমোক্রেতীয় পরমাণুবাদ ও আরিস্তিপ্পুস-এর সুখবাদের একটি মিশেল বলে। যেমনটি স্টোয়িক দর্শন যেন হেরাক্লিতস-এর প্রকৃতি বিষয়ক দূরকল্পনা ও সিনিকদের নৈতিকতার মিশেল, যার মধ্যে কিছু আরিস্ততেলেসীয় যুক্তিবিদ্যা যোগ করে দেওয়া হয়েছে। আর স্কেপ্টিসিজম (সংশয়বাদ) হচ্ছে এসব ডগমাটিক (মতান্ধ) দর্শনের বিরুদ্ধে একটি 'প্রয়োজনীয়-মন্দ'। অসচেতনভাবেই একপেশে পল্লবগ্রাহিতায় হেলেনীয় দর্শনকে যুক্ত করে দেওয়া হয় আলেকজান্দ্রীয় দর্শনের সঙ্গে। আলেকজান্দ্রীয় দর্শনকে মনে করা হয় মহিমান্বিত ও বিশৃঙ্খল এক দর্শন হিসাবে। এ দর্শন একটি বিভ্রান্তি, যাতে বড়জোর ইচ্ছার সর্বজনীনতা সনাক্ত করা যায়।

ধরে নেওয়া হয়, দুনিয়ার সবকিছুই 'জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু' এই লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধা। এ নিয়মে গ্রীক দর্শনের মৃত্যু হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বীরের মৃত্যু ট্র্যাজিক, সন্ধ্যার মত বর্ণিল; ব্যাঙের পেট ফুলে মরার মতো নয়। তবে গ্রীক দর্শনের মৃত্যু কি একটি সফল ট্র্যাজিডি নয় ? জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু এ ছকে দুনিয়ার সব ঘটনাকে ফেলে দিতে পারলেও এতে কোনো ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়ে না। মৃত্যু ও জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। মৃত্যু সবসময়ই জীবনকে জড়িয়ে থাকে। তাই কোনো বিশেষ জীবনকে বুঝার জন্য যেমন ঐ জীবনের নির্দিষ্ট ধরনটির বৈশিষ্ট্যসমূহ বোঝা দরকার, তেমনি কোনো বিশেষ মৃত্যুকে বুঝার জন্য এর নির্দিষ্ট ধরণটির প্রতি নজর দিতে হবে। এভাবেই আমরা গ্রীক দর্শনের অন্তিম পর্বটিতে যথাযথ অনুধাবন করতে পারব। যদি ইতিহাসে একবার দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন কি হেলেনীয় দর্শনকে শুধু এক ধরনের বিশেষ প্রপঞ্চ বলেই মনে হয় ? এ-সব কি রোমক মনের এক ধরনের আদিরূপ নয়, যে মানসিকতায় গ্রীকরা তখনো আগন্তুক ? এ হলো ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের 'নাগরিকের মন' থেকে বৃহৎ সাম্রাজ্যের 'নাগরিকের মনে' রূপান্তর। গ্রীকরা তখন নগর-রাষ্ট্র পিছনে ফেলে হেলেনায়িত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে মাত্র; যা ক্রমে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। হেলেনীয় দর্শনের সারসত্তা কি এতটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঐকান্তিক ও চিরায়ত নয় যে, আধুনিক জগৎ একে সহ-নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য ?

হেলেনীয় দর্শনগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্যই মার্ক্স এসব উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিক গ্রীক সংস্কৃতির সাপেক্ষে এদের গুরুত্ব তার অভিসন্ধর্ভের আলোচ্য নয়। তার অভিসন্ধর্ভের আলোচ্য, প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সঙ্গে এর সম্পর্ক। ঐতিহাসিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে, গ্রীক দর্শন দুটি ধারায় সমাপ্ত হয়েছিল, একটি হেলেনীয় অন্যটি আলেকজান্দ্রীয়। আলেকজান্দ্রীয় দর্শনের চূড়া প্লতিনস-এর 'নব্য প্লাতনবাদ'। এটি লক্ষ্য করার মতো, হেলেনীয় দার্শনিকরা তাদের সাক্ষাৎ পূর্বসূরী, দর্শনের মহারথী প্লাতন ও আরিস্ততেলেসের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে, প্লাতন-পূর্ব দর্শনকে তাদের ভিত্তি করেছেন। এতে ইওনীয় প্রকৃতি-দর্শন তাদের প্রকৃতি-দর্শনের, সক্রাতেসের স্কুল তাদের নীতি-দর্শনের ভিত্তি হয়েছে। তারা দেমক্রিতসকে সুখবাদীদের সাথে (এপিকুরীয়) এবং হেরাক্লিতসকে সিনিকদের সাথে (স্টোয়িক) মিলিয়েছেন। এটা কি কোনো দৈব ঘটনা যে, এপিকুরীয়, স্টোয়িক ও স্কেপটিক দর্শনের ভিতর আত্মচেতনার সবগুলো মুহূর্তই মূর্ত হয়ে উঠেছে; কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তই স্বতন্ত্রভাবে ? এ-মুহূর্তগুলি, বিমূর্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (এপিকুরীয়), বিমূর্ত বিশ্বজনীনতা (স্টোয়িক) এবং এ দুইয়েরই নেতিকরণ (স্কেপটিক)। এ-সব কি দৈব যে, তিনটি দর্শন মিলেই আত্মচেতনা তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ? লোকশ্রুতি অনুযায়ী সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে গ্রীক দর্শনের সূচনা, সক্রাতেস যাদের শিরোমণি। সক্রাতেসই গ্রীক দর্শনে প্রথম আত্মচেতনার দার্শনিক। সব শেষে এটাও কি দৈব যে, হেলেনীয় দার্শনিকেরা আত্মচেতনাকে একটি খাঁটি বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন ?

এটি সত্য যে আরিস্ততেলেস অবধি গ্রীক দর্শন এর বিষয়বস্তুর জন্য আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আরিস্তলেস পরবর্তী গ্রীক দর্শন গুরুত্বপূর্ণ এর বিষয়ী কেন্দ্রিকতার জন্য। আর এটিই তো গ্রীক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য। অথচ এতদিন গ্রীক দর্শনের এই বিষয়ীমুখী বৈশিষ্ট্যটিকেই অবজ্ঞা করা হয়েছে, গুরুত্ব পেয়েছে অধিবিদ্যক বৈশিষ্ট্যটি।

কিন্তু অভিসন্ধর্ভটিতে এ-সব বিষয়ের আলোচনাকে বাদ দিতে হয়েছে। মার্ক্স এখানে নজর দিয়েছেন প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সঙ্গে হেলেনীয় দর্শনের সম্পর্কের উপর। এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্যকে। এর কারণ, প্রাচীন কুসংস্কার হলো এই দুটি দর্শনকে এক করে দেখা। মনে করা হয়, এপিকুরস দেমক্রেতীয় দর্শনে কিছু অর্থহীন খামখেয়ালী পরিবর্তন করেছেন মাত্র। ব্যাপারটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্ক্স এ দুই দর্শনের পার্থক্যটি স্পষ্ট করতে চান। এতে করে প্রাচীন দর্শনের সঙ্গে হেলেনীয় দর্শনের বড় পার্থক্যগুলো সহজে প্রদর্শন করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত সমূহ

প্রাচীনদের মধ্যে কিকেরো মনে করেন, এপিকুরস দেমক্রিতসকে অনুসরণ করার বেলায় বড় ভুল করেন নি। কিন্তু যেখানে তিনি দেমক্রিতসের পদার্থ-বিজ্ঞানকে উন্নত করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি তা নষ্ট করেছেন। প্লুতার্কের মতে এপিকুরসে সামঞ্জস্য নেই।

দেমক্রিতসের দর্শনের দুর্বল দিকগুলোই বরং তিনি পছন্দ করেন। আধুনিকদের মধ্যে লিব্‌নিজ (১৬৪৬-১৭১৬) দেমক্রিতসকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এপিকুরসের সামর্থ্য নিয়েই সন্দিহান।

তৃতীয় অধ্যায় : দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় দর্শনকে অভিন্ন ভাবার সমস্যা

আগের আলোচিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলোর বাইরে যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখব পরমাণু ও শূন্যতা উভয় তত্ত্বেই এক। এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। দুইয়ের মধ্যে শুধু কিছু ছোটখাটো বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই এসব পার্থক্যকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কৌতুহলোদ্দীপক ধাঁধাঁ থেকেই যায়। দুজন দার্শনিক এক তত্ত্ব একই ভাবে শিক্ষা দেন, তবুও এগুলি কতই না বিপরীত ! সত্য, নিশ্চয়তা, এ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ, এবং সামগ্রিকভাবে চিন্তা ও বাস্তবতার সম্পর্ক: এসব ব্যাপারে এরা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। সন্দর্ভের পরবর্তী অংশে তাই প্রমাণ করা হয়েছে।

সত্য এবং মানবজ্ঞানের নিশ্চিতি সম্বন্ধে দেমক্রিতসের মতামত নিশ্চিত করা শক্ত। এ-ব্যাপারে তার পরস্পর সাংঘর্ষিক মতামত পাওয়া যায়। কিংবা প্রাপ্ত নজিরগুলি সাংঘর্ষিক এমনটা নয়, বরং দেমক্রিতসের দৃষ্টিভঙ্গিটিই এমন বৈপরীত্যপূর্ণ। আমরা আরিস্ততেলেসের 'সাইকোলজি' বইতে পাই, 'দেমক্রিতস আত্মা ও মনকে এক মনে করেন। কারণ কোনো বিষয়ের প্রপঞ্চ (অর্থাৎ যা আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাই) এবং আসল বিষয়টি (যা সরাসরি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় না, অনুমান করে নিতে হয়) এক।' মন যেহেতু আত্মার প্রকাশ, তাই আত্মা ও মন এক। আবার আরিস্ততেলেসের 'মেটাফিজিক্স'-এ পাচ্ছি 'দেমক্রিতস বলেছেন কিছুই সত্য নয়। কিংবা এটি আমাদের কাছে আবরিত।' দেমক্রিতসের এ-বক্তব্যটি কি আগের বক্তব্যের বিপরীত নয় ? যদি কোনো বিষয় এবং এর প্রকাশ একই হয়, তাহলে সত্য কিভাবে আবরিত থাকে ? আবরণের কথা তখনই আসে যখন প্রপঞ্চ এবং আসল বিষয় ভিন্ন হয়। দিঅগেনেস লায়েরতিয়স-ও জানাচ্ছেন, দেমক্রিতসকে সংশয়বাদীদের মধ্যে গণ্য করা হত। তিনি দেমক্রিতসকে উদ্ধৃত করেছেন, 'বাস্তবে আমরা কিছুই জানতে পারি না। সত্য কূপের তলায় অবস্থিত।' সেক্সতস এমপিরিকাস-এও এমন বিবৃতি পাওয়া যায়।

দেমক্রিতসের সংশয়বাদী, অনিশ্চিত এবং অন্তর্গতভাবে আত্মবিরোধপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, যখন তিনি পরমাণু এবং আমাদের সংবেদনে জগৎ যেভাবে ধরা দেয় এ-দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। দেমক্রিতস বলেন, 'সংবেদ্য প্রতিভাস পরমাণুর নিজস্ব কিছু নয়। সংবেদ্য প্রতিভাস বিষয়গত নয়, বিষয়ীগত আপাতরূপ মাত্র। সত্য মূলতত্ত্ব হচ্ছে পরমাণু ও শূন্যতা, এর বাইরের সবকিছুই মতামত ও আপাতরূপ। গরম, ঠান্ডা এসব মতামত মাত্র; সত্য পরমাণু ও শূন্যতা। অনেকগুলি পরমাণু মিলিত হয়ে একটি সত্যিকারের ঐক্য গড়ে উঠে না; একটি ঐক্য গড়ে উঠেছে এমনটি মনে হয় মাত্র।' দেমক্রিতসের এমন মনে হওয়ার কারণ, তার তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্য থেকেই কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। পরমাণুসমূহ যেহেতু গুণহীন, তাই পরমাণুর মিলনে গুণযুক্ত নতুন কিছুর উদ্ভব অসম্ভব। আবার তিনি সংবেদনগত প্রত্যক্ষণকেও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই তিনি সংবেদ্য প্রত্যক্ষণকে মতামত বা বিষয়ীগত বলে ঘোষণা দেন।

পরমাণুসমূহ তাদের ক্ষুদ্রতার জন্য চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। কেবল যুক্তির মাধ্যমেই তা বোধগম্য হয়। এজন্য তিনি পরমাণুকে 'ধারণা' বলেও আখ্যায়িত করেন। আবার তিনি এও বলেন, সংবেদ্য প্রতিভাসই একমাত্র সত্য বিষয় এবং সংবেদ্য প্রত্যক্ষণই যৌক্তিক। কিন্তু এই সত্য বিষয়টি পরিবর্তনশীল এবং অস্থিতিশীল প্রপঞ্চ মাত্র। কোনো প্রপঞ্চকে সত্য বলা, তার আগের ঘোষণার বিপরীত। এভাবে দেমক্রিতস কোনো বিষয়ের সংবেদ্য রূপ (প্রপঞ্চ) এবং এর অন্তরালবর্তী রূপ এ-দুয়ের একটি দিককে একবার, আরেকটি দিককে অন্যবার, বিষয়গত বা বিষয়ীগত বলে বিবেচনা করেন। মনে হয়, দ্বন্দ্বমান দিকগুলোকে দুই দুনিয়ায় ভাগ করে দেওয়ার মাধ্যমে দ্বন্দ্বটিকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এই বৈপরীত্যটি বিষয়গত জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে নিজের আত্মচৈতন্যে ঠাঁই নেয়। তার আত্মচৈতন্যে আগে থেকেই পরমাণুর ধারণা বিদ্যমান ছিল। এখন সেখানে প্রবেশ করে সংবেদনগত প্রত্যক্ষণ (বিষয়ীগত অনুরূপতায় পরিবর্তিত সংবেদ্য বাস্তবতা)। এবার সংবেদনগত প্রত্যক্ষণ ও পরমাণুর ধারণা আত্মচৈতন্যের মধ্যে পরস্পরের শত্রু হিসাবে মুখোমুখি দাঁড়ায়। এভাবে দেমক্রিতস অন্তর্বিরোধ থেকে পালাতে পারেন না। বিষয়টিতে পরে আবার ফিরে আসব। আপাতত এটুকুই বলে রাখতে চাই, সমস্যাটির অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

এবার এপিকুরসের বক্তব্য শোনা যাক। তার মতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সংশয়ে অবস্থান না নিয়ে বিশ্বাসে (dogma) অবস্থান নেন। তিনি যা জানেন তা নিশ্চয়তা সহকারেই জানেন। এটিই তাকে অন্যদের তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যায়। তার Canon গ্রন্থে রয়েছে, 'সব সংবেদনই সত্যের বার্তাবহ। সংবেদনকে খন্ডন করার মতো কিছু নেই। একই রকম সংবেদন একই রকম সংবেদনকে খন্ডন করে না। কারণ তাদের বৈধতা সমান। এক ধরনের সংবেদন অন্য ধরনের সংবেদনকে খন্ডন করতে পারে না। কারণ তারা এক বিষয়ে রায় দেয় না। কোনো ধারণা সংবেদনকে খন্ডন করতে পারে না। কারণ ধারণা সংবেদ্য প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল।' দেমক্রিতস যেখানে সংবেদনের জগতকে বিষয়ীগত অনুরূপতায় পর্যবসিত করেন, সেখানে এপিকুরস এ-কে পরিবর্তিত করেন বিষয়গত প্রতিভাসে। এপিকুরস দেমক্রিতসের মতো একই মূলনীতি (পরমাণু ও শূন্যতা) অনুসরণ করলেও, সংবেদ্য গুণাবলীকে নেহায়েৎ 'মতামতে' অবনমিত করেন না। এ অবস্থানের ফলস্বরূপ, জ্যামিতিতে দক্ষ বিজ্ঞানের লোক দেমক্রিতস মনে করেন সূর্য যেমনটি দেখায়, আসলে তা তার চেয়ে অনেক বড়। বিপরীতে এপিকুরস বলেন সূর্য যেমনটি দেখায় ঠিক তেমনটিই বড়। এ-মতামতের জন্য প্রাচীনেরা এপিকুরসকে অজ্ঞ বলতেও ছাড়েননি।

বিজ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং এর বিষয়গত প্রতিভাসের সত্যতা সম্বন্ধে দেমক্রিতস ও এপিকুরসের তত্ত্বগত বিচারের এই পার্থক্য, এ-দুজনের গুণগতভাবে ভিন্ন বৈজ্ঞানিক শক্তিমত্তা ও অনুশীলনে প্রদর্শিত হয়। দেমক্রিতসের মূলনীতিসমূহ প্রতিভাসে প্রবেশ করে না। তাই প্রতিভাস, বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব বিহীন থেকে যায়। অন্যদিকে তিনি আধেয় (content) পূর্ণ এক সংবেদনের জগতের মুখোমুখি হন। সত্য যে, তা 'বিষয়ীগত অনুরূপতা' মাত্র। কিন্তু তা 'মূলনীতি' বা বিষয়গত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজের স্বাধীন বাস্তবতায় বিরাজ করে। একই সঙ্গে এটিই যেহেতু একমাত্র বাস্তব বিষয়, এ-হিসেবে এর মূল্য ও গুরুত্ব আছে। দেমক্রিতস দর্শন সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে, নিজেকে ইতিবাচক (positive) জ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেন। জ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে তার বিচরণ সমীহ জাগানোর মতো। কিন্তু পান্ডিত্যের এ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যই তা প্রস্থে ছড়িয়ে পড়ে, (নিজের বাইরে সন্ধান করে ও তথ্য সংগ্রহ করে), গভীর হয়ে উঠে না। জ্ঞানের তৃষ্ণায়

তিনি দুনিয়ার অর্ধেক পরিক্রমা করেন: মিশরীয় পুরোহিত, পার্সী জ্যোতিষী, ভারতীয় যোগী, সবার কাছেই ছুটে যান; এমনকি লোহিত সাগর পেরিয়ে ইথিওপিয়ায় পা রাখেন। জ্ঞানতৃষ্ণা তাকে তিষ্টুতে দেয় না। অর্জিত জ্ঞানের প্রতি তার অসন্তুষ্টি তাকে আরো তাড়িয়ে বেড়ায়। যে জ্ঞানকে (পরমাণু ও শূন্যতা বিষয়ক জ্ঞান) তিনি সত্য মনে করেন, তা তাকে কোনো আধেয় দেয় না। আবার যে জ্ঞান (ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান) তাকে আধেয় দেয়, তাকে তিনি সত্য মনে করেন না। এমন জনশ্রুতি আছে যে, সংবেদনের আলো যেন তার চিন্তার তীক্ষ্ণতাকে অন্ধকার না করতে পারে, এজন্য দেমক্রিতস নিজেই নিজেকে অন্ধ করেছিলেন। এটি নেহায়েৎ জনশ্রুতি হলেও, তা তার বৈপরীত্যপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। কিকেরোও সাক্ষ্য দিচ্ছেন এ ব্যক্তিটি অর্ধেক দুনিয়া ঘুরেও যা খুঁজেছিলেন তার (সত্যের) সন্ধান পান নি।

এপিকুরস এর ঠিক বিপরীত। তিনি দর্শনেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। তিনি বলেন, দর্শনের সেবা কর, এতেই সত্যিকারের মুক্তি মিলবে। যে দর্শনে আত্মসমর্পণ করে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পায়। দর্শনের সেবাই মুক্তি। এর কোনো বয়স নেই। যদি কেউ বলে যে, দর্শনের সেবা করার জন্য এখনও সময় হয় নি, কিংবা সে সময় পার হয়ে গেছে; তবে এটি যেন এমন যে, তার সুখ লাভের সময় এখনও আসে নি, বা তা পার হয়ে গেছে।

দর্শনে অসন্তুষ্ট দেমক্রিতস যেমন অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের (empirical knowledge) কাছে নিজেকে সঁপে দেন, বিপরীতে এপিকুরস দৃষ্ট বিজ্ঞানকে (positive science) অবজ্ঞা করাই শ্রেয় মনে করেন। কারণ সত্যিকারের পূর্ণতার জন্য এর দেওয়ার কিছুই নেই। এজন্য এপিকুরসকে বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের শত্রু মনে করা হত। কেউ কেউ তাকে অজ্ঞ বলেও আখ্যায়িত করেন। অবশ্য কিকেরোর ভাষ্যে একজন এপিকুরীয় (ভেল্লিউস) বলেন, 'এপিকুরস পান্ডিত্যহীন নন। বরং তারাই অজ্ঞ, যারা মনে করে, একটি শিশুর পক্ষে যা না জানা লজ্জার, বুড়ো বয়সেও তাই আওড়াতে হবে।'

দেমক্রিতস যেখানে জ্ঞানের জন্য মিশরীয় পন্ডিত, পার্সী জ্যোতিষী এবং ভারতীয় যোগীর দ্বারস্থ হয়েছেন, সেখানে এপিকুরস ঘোষণা দেন তার কোনো শিক্ষক নেই। যে অন্যের সাহায্য নিয়ে সত্যে পৌঁছায়, সে মধ্যম মানের মেধাসম্পন্ন। কিকেরো ও সেনেকা দুজনই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এপিকুরস কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই সত্যের জন্য লড়েছেন। দেমক্রিতস যেখানে জ্ঞান লাভের জন্য সারা দুনিয়া চষে বেড়ান, সেখানে এপিকুরস তার আথিনার বাগান ছেড়ে কোথাও বেরোন না। দু-তিনবার তিনি ইওনীয়া গেছেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে; জ্ঞানের সন্ধানে নয়। জ্ঞানের সন্ধানে হতাশ দেমক্রিতস যেখানে নিজেকে অন্ধ করে ফেলেন; সেখানে পরমতৃপ্ত এপিকুরস মৃত্যুর আগে গরম জলে স্নান সেরে, এক পেয়ালা বিশুদ্ধ মদিরা পান করে বন্ধুদের পরামর্শ দেন, তারা যেন দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

আমরা এতক্ষণ দেমক্রিতস ও এপিকুরসের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখলাম, তা নিছক তাদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নয়। এসব দুটি প্রবণতাকে নির্দেশ করে। তাদের আচরণের পার্থক্য, তাদের তত্ত্বগত চেতনার পার্থক্যেরই প্রকাশ। সবশেষে আমরা নজর দেব দার্শনিক 'প্রতিফলনের আঙ্গিক'-এর (form of reflection) প্রতি। এতে চিন্তা এবং সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। একজন দার্শনিক চিন্তা এবং জগতের মধ্যে যে সাধারণ সম্পর্কটি দেখেন, একেই তার নিজের বিশেষ চেতনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করেন।

দেমক্রিতসের জন্য 'প্রতিফলনের আঙ্গিকটি' 'আবশ্যিকতা' (necessity)। এটিই তার কাছে দুনিয়ার নিয়তি, আইন, ঐশ্বরিক বিধি এবং স্রষ্টা। দেমক্রিতসের মতে মানুষ হতবুদ্ধি অবস্থায় 'আকস্মিকতা/আপতিকতা' (chance) আছে এমন ভ্রান্তিতে ভোগে। আকস্মিকতার ধারণা সুস্থ চিন্তার সঙ্গে বেমানান।

এপিকুরসের মতে, কেউ 'আবশ্যিকতাকে' পরম শাসকের আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু কিছু বিষয় ঘটে 'আকস্মিক ভাবে', আর কিছু বিষয় নির্ভর করে আমাদের 'যেমন খুশি তেমন ইচ্ছার' উপর। আবশ্যিকতাকে পাল্টানো যায় না। কিন্তু আকস্মিকতা পরিবর্তনশীল। পদার্থবিদদের 'আবশ্যিকতার নিয়তি' থেকে দেবতাদের পুরাণকথা ভালো। কারণ, দেবতাদের কাছে ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পদার্থবিদদের আবশ্যিকতা থেকে পালানোর পথ নেই। কিন্তু আমরা আকস্মিকতাকে গ্রহণ করব, জনগণের বিশ্বাসের দেবতাদেরকে নয়। আবশ্যিকতার জগতে বাস করা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু সেখানে বাস করাটা আবশ্যিক নয়। কারণ সে জগৎ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনেক খিড়কি, দরজাই খোলা আছে। তারপর এপিকুরস শ্লেষ করেন, আসুন এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই ! তিনি কাউকেই এমন আবশ্যিকতায় জীবনযাপনে বাধ্য করেন নি, আবশ্যিকতাকে অমান্য করার অনুমতি দিয়েছেন।

কিকেরোর ভাষ্যে এপিকুরীয় ভেল্লিউস বলেন, 'স্টোয়িক দর্শনও এমন নিয়তির কথা বলে। এ-যেন একজন বুড়ির মতো, যে মনে করে সবকিছুই ঘটে নিয়তির জন্য। কিন্তু এপিকুরস এ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন।' যেন আবশ্যিকতাকে স্বীকৃতি দিতে না হয়, এজন্য, 'হয় এটি নয় ওটি'– এ ধরনের যুক্তিকেই এপিকুরস নাকচ করে দেন।

তাহলে দেখা গেল, দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য দেমক্রিতস 'আবশ্যিকতা' এবং এপিকুরস 'আকস্মিকতা'কে ব্যবহার করেন। এবং তারা তাদের বিপরীত ধারণাটির প্রতি অসহিষ্ণু। বাস্তব প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর পরিণতি কি, এবার তাই বিবেচনা করা যাক।

সীমিত পরিসরে আবশ্যিকতা হল তুলনামূলক আবশ্যিকতা (relative necessity) যা নির্ধারণবাদে (determinism) রূপ নেয়। তুলনামূলক আবশ্যিকতাকে বাস্তব সম্ভাবনার (real possibility) আকারে পাওয়া যেতে পারে। বাস্তব সম্ভাবনা শর্ত, যুক্তি, কারণ, এসবের একটি জালিকা বিশেষ, যার মাধ্যমে আবশ্যিকতা প্রকাশিত হয়। ধরুন, আপনার হঠাৎ তৃষ্ণা পেল। আপনি দোকান থেকে এক বোতল পানি কিনে তৃষ্ণা মেটালেন। দেমক্রিতস এখানে আকস্মিকতার কিছুই দেখেন না। তার কাছে আপনার তৃষ্ণা পাওয়াটা কার্যকারণ নিয়মাধীন। (যেমন আপনি আগে কতটুকু পানি পান করেছেন, আপনার শরীর কতটুকু পান ব্যবহার করেছে, ইত্যাদি।) দোকানে যে পানি ছিল, যা আপনি কিনে খেলেন, তাও কার্যকারণ নিয়মাধীন। (যেমন দোকানি চাহিদা অনুযায়ী দোকানে পানি রেখেছে। আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় জানেন ওখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। তাই সেখানে গিয়ে পানি কিনে .... ইত্যাদি।) এভাবে কারণ নির্ণয়কে দেমক্রিতস এতই গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি বলেছেন 'পারস্যের সম্রাট হওয়ার চেয়েও কোনো বিষয়ের কারণ আবিষ্কার আমার কাছে বেশি আগ্রহের বিষয়।'

এ-ব্যাপারে এপিকুরস দেমক্রিতসের বিপরীতে দাঁড়ান। আকস্মিকতা তার কাছে এমন এক বাস্তব, যার শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার মূল্য রয়েছে। বিমূর্ত সম্ভাবনা (abstruct possibility) অবশ্য বাস্তব সম্ভাবনার বিপরীত পদ। বাস্তব সম্ভাবনার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে,

যেমন আমাদের চিন্তার। অন্যদিকে বিমূর্ত সম্ভাবনা সীমাহীন, যেমন আমাদের কল্পনা। বাস্তব সম্ভাবনা কোনো বিষয়ের আবশ্যিকতা ও বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করে। কিন্তু বিমূর্ত সম্ভাবনা ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না, তা নিবদ্ধ থাকে ব্যাখ্যাকারীর মনে। বিষয়টি শুধুমাত্র সম্ভাব্য ও বোধগম্য হলেই হল। এমন বিমূর্ত সম্ভাব্য ও বোধগম্য বিষয় চিন্তাকারী ব্যক্তিটির মনে কোনোরূপ বাধা তৈরী করে না। বিষয়টি আদতেই বাস্তবে রয়েছে কিনা এটি ব্যক্তিটির জন্য অপ্রাসঙ্গিক। কোনো বিষয় হিসাবেই বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ নেই। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতামতের প্রতি এপিকুরসের মনোভাবেই এটি প্রকাশিত। কোনো বিষয় (যেমন গ্রহদের গতি) নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণাকে তিনি সম্ভাব্য সত্য হিসেবে ধরে নেন। কোনো একটি বিশেষ মতামতকে তিনি অধিক সত্য বলে মনে করেন না। যারা তা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক তুলেন, 'অনুমানের মাধ্যমে যে ধারণায় আসা হয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে ধাবিত হওয়া ঠিক নয়।' এজন্য বাস্তব বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানে তার আগ্রহ নেই। তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিটির মানসিক প্রশান্তি। যেহেতু সব সম্ভাবনাকেই সম্ভাব্য বলে স্বীকার করে নেয়া হয় (যেটি বিমূর্ত সম্ভাবনার সঙ্গে মানানসই) তাই, 'সত্তার সম্ভাবনা' 'চিন্তার সম্ভাবনা'য় রূপান্তরিত হয়। একমাত্র যে নিয়মটি তিনি বেঁধে দেন, 'ব্যাখ্যাটি যেন সংবেদন বিরোধী না হয়'। এর কারণটি স্বতঃপ্রকাশিত, বিমূর্ত সম্ভাবনা মানে দ্বন্দ্বহীনতা। দ্বন্দ্বকে পরিহার করার জন্যই এ নিয়ম। এপিকুরস স্বীকার করেন, তার পদ্ধতি আত্মচেতনার প্রশান্তির (atraxy) জন্য, প্রকৃতিকে জানার উদ্দেশ্যেই জানার জন্য নয়। এসব ব্যাপারে তিনি দেমক্রিতস থেকে কতটুকু ভিন্ন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ দুটি ব্যক্তি প্রতিটি পদক্ষেপেই কীভাবে পরস্পরের বিপরীত। একজন সংশয়ী, অন্যজন বিশ্বাসী। একজন সংবেদ্য জগতকে বিষয়ীগত আপাতরূপ মনে করেন, অন্যজন একে মনে করেন বিষয়গত প্রতিভাস। যিনি সংবেদ্য জগতকে বিষয়ীগত আপাতরূপ মনে করেন, তিনি নিজেকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ইতিবাচক জ্ঞান সন্ধানে নিয়োজিত করেন। এজন্য তিনি ক্লান্তিহীন পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ও শিক্ষণে দুনিয়া চষে বেড়ান। অন্যজন যিনি প্রপঞ্চময় জগতকে বাস্তব মনে করেন, তিনি অভিজ্ঞতাবাদকে নিন্দা করেন। আত্মতুষ্ট চিন্তার প্রশান্তি তার মাঝে মূর্ত হয়ে উঠে। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার অভ্যন্তরীণ নীতি থেকেই জ্ঞান আহরণ করে।

কিন্তু দ্বন্দ্বটি আরো অগ্রসর হয়। সংশয়ী অভিজ্ঞতাবাদীটি, যিনি সংবেদ্য প্রকৃতিকে বিষয়ীগত আপাতরূপ মনে করেন, তিনি এটিকে বিচার করেন আবশ্যিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। অন্যদিকে বিশ্বাসী দার্শনিকটি, যিনি প্রপঞ্চকে বাস্তব মনে করেন, তিনিই সবখানেই শুধু আকস্মিকতা দেখেন এবং তার ব্যাখ্যার পদ্ধতি বরং প্রকৃতির সব বিষয়বস্তুর বাস্তবতাকেই নাকচ করে দেয়। মনে হয় এ বৈপরীত্যে উদ্ভট কিছু রয়েছে। যারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী, তারা একই নীতিতে নিষ্ট, এমনটি মনে করা কষ্টকর। কিন্তু তবুও মনে হয়, তারা পরস্পর যেন কোনো শেকলে বাঁধা।

পরের দুটি অধ্যায়ের বিষয়, সাধারণভাবে এ সম্পর্কটি বোঝা। (এ দুই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।)

[মার্ক্সের থিসিস রচনার সময় অগুস্ত কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ দানা বাঁধছিল। দেমক্রিতসকে প্রত্যক্ষবাদের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। দেমক্রিতসের জ্ঞান-তত্ত্বের সমালোচনার মাধ্যমে মার্ক্স প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞান-তত্ত্বেরই সমালোচনা হাজির করেছেন। হাল আমলের প্রত্যক্ষবাদের উত্তরসূরীদের বেলাতেও এটি প্রযোজ্য। আর এপিকুরসের জ্ঞান-তত্ত্বের সমালোচনা, মূর্ত বিষয়ে জানার বেলায় শুধুমাত্র তত্ত্বনির্ভর বিমূর্ত যুক্তিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ার সমালোচনা। এপিকুরীয় নোটবইয়ে মার্ক্স লিখেছেন, 'কল্পনা নির্ভর পদ্ধতিতে সব মূর্ত নির্ধারণ ধ্বসে পড়ে এবং বিকাশের স্থান নেয় একঘেয়ে প্রতিধ্বনি।' অনেক মার্ক্সবাদীই এই দোষে দুষ্ট। বিজ্ঞানের জ্ঞান-তাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে পরিণত মার্ক্সের বক্তব্যটি মনে করা যেতে পারে। মার্ক্সের মতে, বিজ্ঞান, সারসত্তা ও প্রতিভাসের মধ্যকার দূরত্বের জ্ঞান-তাত্ত্বিক ফলাফল। (Science is the epistemological outcome of the distance between essence and appearance.)] ....চলবে

সংগৃহীত